অ লো ক র ঞ্জ ন দা শ গু প্ত

কবিবন্ধু-র রেখালেখ্য

উৎপল আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। সেই কারণেই তাঁর বিষয়ে নিরাসক্ত কোনো প্রতিবেদন রচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অথবা বুঝি, শঙ্খ ঘোষ প্রসঙ্গে সম্প্রতি যা লিখেছি, বন্ধুতাই সেই মানদণ্ড যা না থাকলে, বিশেষত আমাদের এই অনিকেত সময়ে, কোনো কবিপ্রতিভার যথার্থ নিরূপণ সম্ভবপর হতে পারে না। উৎপল নিজেও বোধ করি এ কথা বিশ্বাস করেন। নির্মোহ তাঁর যুক্তিবিবেক, বিস্তৃত তাঁর অধ্যয়নের বলয়। তাঁর স্বভাবের সেই সমৃদ্ধি বর্জন না করেও তিনি যখন তাঁর কোনো সতীর্থের কবিতা বিষয়ে কথা বলেন, তার ভেতরে এক ধরনের মায়াবী মমতা লেগে থাকে। উৎপলের ব্যক্তিত্ব ও কবিতা নিয়ে এখানে আমি যে দু-একটি কথা বলব তার পরিসরেও কি ভালোবাসা জেগে থাকবে না?

বন্ধুত্বের এই শর্ত, সন্দেহ নেই, অন্তত উৎপলের ক্ষেত্রে, একরকম মননজাত সমানুভূতির পারমিতা। একবার সিমলার ইনস্টিট্যুট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি-র আলোচনাচক্রে 'হাংরি জেনারেশন' প্রসঙ্গে আলোচনা করে ভাবাসঙ্গে উৎপলের কবিতা ইংরেজি তর্জমাসুদ্ধু যখন পড়ে শোনাই, হিন্দি ভাষাশ্রিত মনস্বী কবি অজ্ঞেয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'এই আন্দোলনের সঙ্গে কি ইনি চূড়ান্তভাবে যুক্ত?' তাঁকে আমি তখন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, নিজস্ব সত্তার শৈলী নিয়েই ওই আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

তখন শংকর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অনবদ্য 'এই দশকের কবিতা' বেরিয়ে গিয়েছে। মনে আছে, সিমলা যাবার মুখে শংকর আমায় নিবিড় অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর সংকলনে উৎপলের যে কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের একটিও যেন হিমাচল প্রদেশের সেই আসরে পড়তে না ভুলি। শংকরের কাছে আমার কথা রেখেছিলাম। উৎপলের সেই সাতটি কবিতাই ভারতীয় সাহিত্যের নানাভাষী দিক্‌পালদের আমি শুনিয়ে প্রগাঢ় আনন্দ পেয়েছিলাম। তাঁরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাঘা মার্কসবাদী সজ্জাদ জহীর। তিনি বলেছিলেন 'এই কবি যে আন্দোলনের মধ্যেই থাকুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে, তিনি একা। এই একাকিত্ব কবিতার পক্ষে যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, কোনো সম্মেলক প্রবর্তনার শামিল নয়। আপনার এই বন্ধুকে বলুন, মার্কসবাদী হতে। তাহলেই তাঁর সঙ্গ-হীনতার উপসর্গ কেটে যাবে।'

সজ্জাদ জহীরের ভাবিকথন অচিরেই সত্য হল। তার অর্থ এই নয় যে 'কৃত্তিবাস' অথবা 'হাংরি প্রজন্মের' ভিতরে উৎপল মৈত্রীর তাপ বিকিরণ করেননি। আসলে তিনি কবিতার জন্য, সম্ভবত নিজের জন্যেও, এমন একটি বড়ো জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে

অস্মিতাকে লুপ্ত করে দেওয়া যায়। তাই বুঝি লন্ডনে কিট্‌সের সেই পুরাণপ্রতিম কবিতাভবনের অদূরে উৎপলের ডেরায় আমরা যখন গিয়েছিলাম, লক্ষ করেছিলাম, তিনি নিজের কথা এতটুকু না বলে আর সকলের কথা জানতে কেমন উদ্‌গ্রীব। সেই আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে তবু ছমছমে একটি বিষাদ আমায় গ্রস্ত করে নিয়েছিল : উৎপল কত কথাই তো বললেন, একবারও কবিতা বিষয়ে একটি কথাও বললেন না কেন?

হাইডেলবার্গের দক্ষিণ এশিয়া বিদ্যার ইনস্টিট্যুটে, এই ঘটনার ক-দিন পরেই, 'একটি কবিতা জন্ম : সমকালীন ভারতকবিতায় নতুন নন্দনচিন্তার সন্ধান' মর্মে একটি দীর্ঘায়িত সেমিনার করতে গিয়ে মনে হল, তাঁর ওই তৃষ্ণীদশা ঈষৎ খুঁচিয়ে দেখি। তাঁকে টেলিফোন করলাম, চিঠি দিলাম। তিনি বেশ কিছুদিন বাদে তার উত্তরে যে চিঠি (লন্ডন, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১) দিলেন তার পরতে পরতে, নিষ্ঠুর নির্বেদ ছাড়াও কবিজনোচিত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের পরিচয় মেলে :

'...আপনি জানেন যে বাংলা কবিতায় আমার উৎসাহ বর্তমানে খুবই কম—প্রায় নেই বললেই চলে। এটা আজকের ঘটনা নয়। অনেক বছর আগে, আমি যখন কলকাতা ছাড়ি, তার আগে থেকেই বাংলা কবিতা বলতে যা বোঝায় তার ভেজালতা ও অসারতা লক্ষ করেছি। ওই কবিতার সঙ্গে, দেশের সমাজের এবং বৃহৎ অর্থে মানসিকতার কোনোই যোগাযোগ নেই। কবিতা লিখে, এবং ছাপিয়ে খানিকটা আত্মতৃপ্তি হয়েছিল—'ইগো'র তাড়না খানিকটা শান্ত হয়েছিল...ওই অবস্থায়, আমি পকেটে তিন পাউন্ড সম্বল করে লন্ডনে এসে হাজির হলাম এক ডিসেম্বর মাসে। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে—সহজে কিছুই পাওয়া যায়নি। যদিও পশ্চিম দেশ প্রাচুর্যের দেশ—কিন্তু এমনই 'হস্টাইল' সমাজব্যবস্থা যে অসতর্কের বিপদে অনিবার্য, কেন-না এসব দেশের ঐশ্বর্যের মূল হল শোষণধর্মী—দূরের গরিব দেশগুলির শোষণ বা নিজেদের দেশের মধ্যেই দরিদ্রের শোষণ, অসমর্থকে নিষ্পেষণ। তখনই মনে প্রশ্ন জাগে যে তাহলে কি মঙ্গলজনক, সুষ্ঠু, নতুন সমাজব্যবস্থা আমরা তৈরি করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি—কেন-না মানুষের অসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু সেখানে ওই প্রাচীন কবিতার আর কোনো স্থান নেই এবং অনিবার্য বলেই আমার 'ব্যক্তিগত লিখন ভঙ্গিমা' পথের মধ্যে হারিয়ে গেল...'

বন্ধু বলেই তিনি আমায় অনুমতি দিয়েছিলেন, তাঁর এই পত্র অনুবাদ বা গবেষণার কাজে লাগাতে পারি। লাগিয়েও ছিলাম। কবিতাসংক্রান্ত সেমিনারে যাঁরা তাঁদের কবিতার উৎসারণ দিয়ে তন্নিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হয়েছিল এই কবি নিজের এবং সময়ের কাছে সত্যবান। তাঁর এই সততা বিষয়ে আমার মনে আজও সামান্যতম সংশয় নেই। কিন্তু তাঁর চিঠির শেষদিকের উক্তিটি ('আমি ওই জগৎ অনেক পেছনে ফেলে এসেছি—এবং ফিরে যাবারও কোনো ইচ্ছে নেই'।) আমার কাছে এখনও ছদ্মভাষণের মতন মনে হয়। তার কারণ, উৎপল শেষ অবধি

কবিতার কাছেই ফিরে এসেছেন।

বস্তুত কবিতা কলকাতার কাছে ফিরে আসার গরজেই বুঝি অন্তর্বর্তীকালীন তাঁর অত আত্মক্ষয়, এত অন্বেষা এবং নতুন অভিজ্ঞতার বিস্তার। এরই দৌলতে মার্কসবাদের শাস্ত্রিক এবং প্রয়োগসিদ্ধ সূত্রগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। ফিরে এসে 'চিত্রবাণী'তে তাঁর যোগদান ও কাজকর্ম এক হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ কবিতার অভিমুখে নির্মীয়মান সোপানের মতন। এখানে সরেজমিন চর্যার মধ্যবর্তিতায় শিল্পের দৃশ্যনির্ভর এবং শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন মাধ্যমের অন্তঃস্থ যোগাযোগের প্রয়োজন এবং সেই সূত্রে গণশিক্ষকের প্রতি তাঁর নিরন্তর অঙ্গীকার শুধু তাঁর নিজের কবিতার জন্যই নয় তাঁর অপরাপর কবিবন্ধু এবং তরুণ প্রজন্মের কবিদের পুনর্বিন্যাসের জন্যেও কত শিক্ষণীয় এবং উপকারী হয়েছে, সে-বিষয়ে নতুন করে কিছু না বললেও চলে। আমরা, তাঁর বন্ধুরা, জানি তাঁর এসব উন্মীলনের প্রাসঙ্গিকতা অনেকের কাছেই প্রথম দিকে প্রমাণিত হয়নি, বরং নাটকীয় বাড়াবাড়ির মতোই ঠেকেছিল। কিন্তু একরোখা নিষ্ঠায় তিনি দুরূহ এই ব্রতে অচ্যুত থেকেছেন। এজন্য আমরা আজ তাঁর কাছে ঋণবদ্ধ। তরুণ কবিদের সঙ্গে একাধিক বিনিময়েও একথা জানবার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁরা এই কবির অক্লান্ত শিল্পযোগ এবং মানবিক মুক্তিবোধের প্রতি কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ।

ফলত যাদের উৎপল অনবরত উদ্দীপিত করতে চাইছেন এবং যাঁরা তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়ে চলেছেন, উভয়তই ওর কাছে এর প্রত্যাশা আরও বেড়েই চলেছে। এক এক সময় উৎপল যখন আমাদের তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং থিয়োরিসহ সংহিতায় শিক্ষিত করে তুলতে চাইছেন, অব্যবহিত ধারাভাষ্যের প্রত্যক্ষতার লিখছেন :

তাকে ছন্দের নিয়তি
গুহার গভীরে ডাকে, খাদের অতলে ডাকে, সতী
জ্বলন্ত আগুনে ডাকে; আজ কবিতা বা
অন্ত্যমিল তথা
শুধু রঙ, চিত্রার্পিত, রেখাপাত—নয় কোনো কথা

আমরা, ঠাহর করতে পারি, তিনি আমাদের কাছে মিশ্র মাধ্যমের সমন্বিত অথচ অতিশায়ী রহস্যঋদ্ধি দাবি করেছেন, আমরা তাঁর তিয়াষা মেটাতে পারছি না বলেই তাঁর কবি-অভিপ্রায় (Kunstwollen) হয়তো সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে নিতে এখনও অক্ষম।

অথচ দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতেই পাঠকের কাছে আভাসিত হতে থাকে কবির চিন্তার ন্যূনতম এই সিনট্যাক্স, তিনি বোধহয় বলতে চাইছেন, নিছক শব্দ দিয়ে শিল্পসমগ্রকে আয়ত্ত করে নেওয়া যাবে না আর, সেই সঙ্গে চাই পারিপার্শ্বিক বর্ণসম্পাত ও রেখার যোগসাজশও। এতটা আঁচ করে নেওয়ার পরেও, কবুল করতেই হবে, কবির বক্তব্য তাঁর কাছে তেমন উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে না।

এমন দাবি করলে অনৈতিহাসিক হবে, উৎপলের পূর্বপর্যায়ী কবিতাও সরাসরি অপাবৃত হতে চেয়েছিল। মনে রাখতে হবে, বাংলা কবিতায় তিনি অন্তর্বৃত একটি অভিনব বাক্‌রীতি করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন বিনয় মজুমদার, এবং অংশত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও। কিন্তু উৎপলই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সচেতন বেপরোয়া ছিলেন এবং অসীম সাহসিকতার সৌজন্যে সেই কারণেই কবিতার অন্তঃশরীরে বুনে দিতে পেরেছিলেন আপাত অসংগত শাখাপ্রশাখার দুর্জ্ঞেয় আলিম্পনগুণ। 'ইহাতে এই বাক্যগঠনে চোরা রাজসিকতা রহিয়াছে, দর্প রহিয়াছে, যে প্রকৃতির বাড়ি যেন আদি বক্তার নখদর্পণে', কমলকুমার মজুমদারের অমোঘ বর্ণনায় এই নতুন কবিতার চারিত্ররূপ চমৎকার উঠে আসে। এবং এরই জের ধরে বলা যায়, কমলকুমার তখন বাংলা গদ্যে যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন, বাংলা কবিতায় খুব সম্ভব উৎপলের মাধ্যমেই সেই ক্রান্তি সংঘটিত হয়েছিল।

এঁরা ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন? উভয়েরই মন দস্তুর মতো নাগরিক, কিন্তু উভয়েই, অনাদি গ্রামীণ জীবনবোধের কাছে এক-একবার দীক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নাগরিকতার অনুশীলিত (Sophisticated) পারম্পর্য থেকে ভাষাশিল্পকে বেবল্‌গা করে দিতে চেয়েছিলেন। হয়তো-বা জয়েসীয় মগ্নচৈতন্যস্রোত তাঁদের শিল্পস্বজ্ঞার আড়ালে কাজ করে থাকবে। কিন্তু বাঙালি ধাঁচের প্রাত্যহিকতাকে আঘাত করাই ছিল তাঁদের অভিরুচি। কমলকুমারের গদ্যে কৌম সংগীতের ইন্দ্রজালের সংকেতও এই মর্মে স্পষ্ট : 'ঐ গীতে এই সকল কিছু (এই অংশটি পরবর্তী পর্বে তাঁর স্বহস্তযোজিত) যেই কিনা উহা ঐ গীত হউক, যে চাঁদ অস্থির হইবেক; ঐ গীতের দিকেই সে আছে, তাহার পোষমানা ভয় আছে তাহার ঘর যে এবং।' অর্থাৎ প্রথানুগত অন্বয় থেকে সংগীতে ছুটি নেওয়ার সময়েও গ্রাহক বা শিল্পীর মানসে তার নগরনিরাপত্তাজনিত 'পোষমানা ভয়' সক্রিয় হয়ে আছে। কমলকুমার এবং উৎপল, 'সান্ধ্যভ্রমণের চেঞ্জাররা' নব্য বাঙালি বাবুসমাজের অনির্দেশ্য নিষ্ক্রমণ ও পোষ্যপোষক নিয়ন্ত্রণের অন্তর্বয়রে সৌন্দর্যেই সেদিন এরকম কিছু মন্ত্র রচনা করতে পেরেছিলেন।...

১. এমনও কি ওই গীত-জাত উদ্দীপনার মধ্যে, নস্টালজিতে...জানার হেতুতে... যাহারা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এবং যাহাদের কর্তব্য আপনি স্থিরীকৃত সুখে ভ্রমণ করে...ইহারাই তাহারা যাহারা আধোচন্দ্রালোকে নিঃসঙ্কোচে এক ইউক্যালিপটস গাছের নিম্নে সমবেত হইয়া দাঁড়াইয়া পাতার আওয়াজ শুনিয়াছে, সকলেই চুপ ছিল, একাগ্র থাকে;...ধিক্ তাহাদেরকে যাহারা ইউক্যালিপটসের উপকারিতা বিনাইয়া থাকে...

২. ...চাঁদ দেখে মনে পড়ে কেন্দ্রীয় কৃষিসমবায় গিরিডির মাঠে ওই যূথবদ্ধ ইউক্যালিপটস তোমাদের রাজ্যপাল একাদশ মনে হয়।

উৎপলের লেখায় এই ঘোর লাগা চৈতন্যের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিগত বাক্‌বিধি (ideolect) উদ্‌বর্তিত হয়েছিল। মানুষের এক-একটি আয়ুযাপনের স্বকীয় আস্বাদ' এবং

উদ্যমের অন্তর্লীন নশ্বরতার টানাপোড়েনে প্রণীত হতে পেরেছে এরকম অনিন্দ্যসুন্দর পঙ্‌ক্তিস্পন্দ : 'স্বপ্ন ফুরায় আর সময় ফুরায় আর সামান্যই থাকে/দু-চার বসন্ত আমি ঘোরালাম সামান্য লেখাকে।' এবং বাংলা কাব্যধারার মন্দাক্রান্ত প্রহরে প্রবর্তিত হতে পেরেছিল একটি 'ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা' যা নাকি মাঝখান থেকেই স্বয়ম্পূর্ণ পরা-কাহিনি শুরু করে দিতে পারে : 'তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি।'

জার্মান ভাষায় এই 'পুরী সিরিজ গ্রন্থের শেষ কবিতা' এবং 'ভোর সাড়ে ছটা'-র মতো কবিতাগুলি সঞ্চারিত হতে একতিল দেরি হয়নি। কেন-না সেখানে থেকে গিয়েছিল গ্যুন্টার আইশ্‌ এবং হাইসেনব্যুটেলের মতো ডাকসাইটে কবিদের উত্তরাধিকার যা মানুষের ভাষাকে দৈনন্দিন গৃহীর 'পোষমানা ভয়ের' কবল থেকে কবেই খালাস করে দিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য, লোথার লুৎসে এবং আমার সম্পাদিত দুই বাংলার কবিতাসংকলনে (Gangesdelta/১৯৭৪) এসব কবিতা আবিষ্কার করে লাজুক ভারততাত্ত্বিক গ্যুন্টার সোনঠাইমার আমাদের বলেছিলেন : 'এখানে আমরা নতুন ভারতবর্ষের আত্মিক বিন্যাস দেখতে পাচ্ছি। এমনকি যদি বলি, প্রচ্ছন্ন ইয়োরোপীয়তা সত্ত্বেও এই কবিতাগুলির মধ্যে ধরা দিয়েছে এক ধরনের হালকা উত্তরণ, এক ধরনের প্রাচ্যমায়া, যা আমার মতো অসাহিত্যিককেও কয়েক মুহূর্তের জন্য আবিষ্ট করে দেয়।'

আমার মনে হয়, এই নির্ধারণে উৎপলের কবিপ্রতিভার প্রস্থানভূমি যথাযথ শনাক্ত হতে পেরেছে।

৩

এই পটভূমির ব্যাপ্তি মনে রেখে তাঁর এখনকার রচনা, বিশেষত কবিতা, পড়লে আবিষ্ট হবার অবকাশ ততটা কি পাওয়া যায়, এখন 'বাঁধুনি' তাঁর লক্ষ্যমাত্রা, যদিচ তাঁর উচ্চাশা কবিতার পরগনাকে ছাপিয়ে যেতে চায়।

এই দেশ ছোটো তবু বড়ো তার দেবদেবীগুলি
রক্তমুখ, রূঢ়, ত্বক, নখে আবৃত অঙ্গুলি
দীর্ঘ কঠিন পথ, শীর্ষে বাঁক, এসেছ বিস্ময়
ঐ উপাস্যের হাসি যেন—জন্ম নেয় ভয়

পরিখার প্রান্তে খাদ, আরো নীচে উল্টে আছে যান
বর্ষার দুর্ঘটনা, গ্রীষ্মের আগুন বাগান

কোন শতাব্দীর কথা? কত লোক মরেছিল
তুমিও ছিলে কি?

এখানে চোখে পড়ে যায়, কবিতার সময়হীনতা থেকে আমাদের দিকে তাঁর নিরাভরণ অবরোহণের ঠাম, মৌলবাদের শোচনীয়তা থেকে শুরু করে ত্রিতাপবেষ্টিত শহরগুলির কদর্য বিপর্যয়গুলির পরিসংখ্যান নেওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস। এত ভার কবিতা কি বইতে পারে?

পারুক না পারুক, কবিতাকে এখন, এখনই, বিশ শতক শেষ হয়ে আসার মুহূর্তপুঞ্জে, এসব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতেই হবে। এ এক কিম্ভূতকিমাকার সময় যখন পণ্যবাদের স্বাচ্ছন্দ্য স্পৃহা আর সমাজতন্ত্রের বুলি উপজীব্য করে আমাদের ভাগ্যবিধাতারা তাঁদের ক্ষমতা অটুট রাখবার চেষ্টা করছেন। এই-ই তো, সেই অবধারিত সময় যখন কবিকে বলতেই হবে :

শোনো...পোড়োমুখের গান
যে-যার মতো জ্বলে
সব্জিভরা আগুন
খাও...দু'হাত পেতে খাও
আগুন দিয়ে ভাতের দলা মাখো...

আমার বিনীত বিবেচনায়, এই নব্যরীতির কবিতার দৃশ্যপট আমাদের কাছেপিঠে ঘটছে বলেই তার নিষ্করুণ সত্যতা আমরা তেমন অনুধাবন করতে পারছি না এবং সেই কারণেই এই কবিতার একটি বড়ো অংশ আমাদের অননুভূত থেকে যাচ্ছে। আমি বলতে চাইছি না, কবিতার চারপাশে ঘটতে থাকা এই বাস্তব পরিগ্রহণ করতে পারলেই যেন উৎপলের এই পর্যায়ে সমস্ত লেখা বিষয়গুণেই শাশ্বত হয়ে থাকবে। আমি শুধু এখানে এটুকুই বলতে চাই, উৎপল এসব লিখে এই পর্বের প্রতি তাঁর অনপনেয় বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করছেন। এজন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

৪

বছর কয়েক আগে পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যিক অনুবাদ নিয়ে যে ওয়ার্কশপ করেছিলাম, উৎপল ছিলেন তার বাংলা ইউনিটের নিয়ন্তা। ওড়িয়া-মৈথিলি-নেপালি-মণিপুরি-অসমিয়া এবং বাংলা ভাষার প্রতিনিধিদের কাছে তখন তিনি থেকে থেকেই বলতেন : 'হেরমেনিউটিক্স বলে একটা ব্যাপার আছে এবং তারই দৌলতে প্রতিটি ভাষার প্রতিটি অনুবাদ কবিতাকে নতুনতর একটি ভাষ্য হয়ে উঠতে হবে।' এরই রেশ ধরে আমি বলব, বাংলা ভাষায় লেখা প্রতিটি কবিতাই আজ আমাদের যাপিত স্বকালের ভাষ্য হয়ে উঠতে চায়। উৎপলের কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং, এর সঙ্গে আরও একটি প্রস্বর জুড়ে দিয়ে বলা চলে, উৎপলের সাম্প্রত কবিতাবলি, কবিতাকে এই জটিল সময়ের দায়ভার থেকে দূরে সরিয়ে না রেখে কবিতারই ধারণক্ষমতা ও প্রাণপরিসরকে প্রসারিত করে নিতে উদ্যত। ভবিষ্যতে এদের ভিতর থেকে কতটুকু

থেকে যাবে সেটা নিয়ে কষ্টকল্পনা এখন নিতান্তই অবান্তর বলে মনে করি।

২৯ এপ্রিল '০৬ : বছর কয়েক আগে 'যোগসূত্র' পত্রিকার মাধ্যমে উৎপল বিষয়ে আমার যে মুগ্ধবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল, আজ তাঁর বড়ো একটি পুরস্কার প্রাপ্তির পরেও তার একটি বর্ণও আমি খারিজ করে দিতে পারলাম না। আজ আমার ওই বন্ধু লোকায়তের এলিট এবং এলিটের মাঝখানে সেতুপুরুষ হয়ে আমাদের যে-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করে নিয়েছেন, সেই মর্মে আমার অহংকার পুনর্বার ব্যাখ্যা করবার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি।

কবিতা প্রতিমাসে, এপ্রিল ২০০৬, উৎপলকুমার বসু সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

বি জ য়া মু খো পা ধ্যা য়

উৎপলকুমার বসু স্মরণে

উৎপল, তাঁর ছোটো পরিবার— স্ত্রী সান্ত্বনা, পুত্র ফিরোজ সহ যখন বিদেশ থেকে দেশে ফিরলেন, তখন শরৎকুমার ও আমি এই মেঘমল্লার বাড়িতে তিনতলায় ছোটো একটা ফ্ল্যাট 'বুক' করে বসবাস শুরু করে দিয়েছি। এর আগে আমাদের ভাড়াবাড়িতে কিছুকাল অতিথি হয়ে থেকেছিলেন উৎপল। তিনি এমনই একটা ফ্ল্যাটের খোঁজে নানা জায়গায় বলছিলেন। এই শুনে শরৎকুমার তাঁকে এ বাড়িরই দশতলার এক ফ্ল্যাটের সন্ধান দিলেন, যেটাতে লিফ্‌ট ছাড়া ওঠানামা করা মুশকিল। উৎপল সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধা-যুক্ত ওই উঁচু ফ্ল্যাটই নিয়ে নিলেন— তাঁর সুবিধে-অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও। সেই থেকে আমরা প্রতিবেশী। তার চল্লিশ বছর পর সম্প্রতি অসুস্থতার চরম পর্যায়ে গিয়ে বন্ধু উৎপল ৭৮ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

কেন তাঁর কথা আমি লিখছি— অনেকের মনে হতে পারে। শরৎকুমার এখন লেখালেখি প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, দৃষ্টিশক্তির অভাবের কারণে। তিনি চশমা পরেন না, একটি 'ম্যাগনিফাইং কাচ' ব্যবহার করেন— পত্রিকা পড়া ও অন্য বিশেষ কিছু কাজের জন্য। 'পড়ার জন্যই তাঁর কাচ, লেখার জন্য নয়'—এ কথা প্রায়ই শুনি। লেখাপড়া আমিও কম করি, যতটা না করলে নয়, ততটুকুই। এক্ষেত্রে তাহলে কেন লিখছি— এর উত্তরে বলি, উৎপলের লেখার নতুনত্ব আমাকে মাঝে মাঝেই চমকে দিত। প্রায়ই আমি তাঁর কাছে সাহিত্যের নতুনরকম সংজ্ঞা, 'ইনটারপ্রিটেশন' পেয়েছি। যেমন পেয়েছি আর এক কবিবন্ধু প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কাছ থেকে। উৎপলের দশতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে বহু সময় আমি তাঁর সংগ্রহের ছবিসমূহ দেখে তাঁর কাছে, সেসবের বিশেষত্ব জানতে পেরেছি। তা ছাড়াও কফিহাউসে যাওয়া, অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা ও শোনা, (৫ ও ৬ দশকের)

এগুলি আমাকে আকৃষ্ট করত, যেহেতু আমাদের স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যাওয়া সবসময় ঘটে উঠত না— জীবিকা তো বজায় রাখতেই হবে।

আমার লেখায় শরৎ উৎসাহ দিতেন খুব, আমার পড়ানো— চাকরির ফাঁকে ফাঁকে, অফ পিরিয়ডে অনেক টুকরো কবিতা লেখার সুযোগ ছিল। আমার 'শ্রেষ্ঠকবিতা' বেরোবার আগে একটা বই ছাপা হয়েছিল 'কবিতাসংগ্রহ' নামে। সে-বই আর কারও কাছে না থাকতেও পারে। এই কবিতা সংগ্রহ শঙ্খ ঘোষকে উৎসর্গ করা। 'সপ্তর্ষি প্রকাশনের' বই। এরই ১৩৬ পৃষ্ঠায় 'বন্ধুত্ব' কবিতায় দেখছি এই লাইন—

'আমাদের বন্ধুত্বে রয়েছে সততার ঈষৎ ব্যত্যয়—
বললো উৎপল
প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে সায় দিয়ে দিলো
পাশে-বসা নির্বিকার তিনজন দুর্ধর্ষ ভদ্রলোক'—

আজকে আমারও খুব অবাক লাগছে, এ লাইন লিখলাম কী করে?

শঙ্খবাবু আমাদের বন্ধুস্থানীয়। শরৎ এবং আমি না বলে-কয়ে ওঁর শান্তিনিকেতনের বাসায় গিয়ে উঠেছি; উনি দুপুরে খেতে এসে আমাদের কবিতা— সমস্যা মেটাবেন বলে। তিন দিন থাকতে বাধ্য করলেন। ষাটের সঙ্গে পঞ্চাশের এটা একটা বড় তফাৎ।

উৎপলের মৃত্যুতে আমরা বহু মানুষ শোকাহত। এটুকু জানাতেই এই সামান্য লেখা।